

১৩-৩-৩৫

লোক-প্রশাসন সাময়িকী

ত্রয়োবিংশতিতম সংখ্যা, জুন ২০০২/জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯

৩২/৩/০৫

সম্পাদনা পরিষদ

ড. এম মতিউর রহমান

সৈয়দ শামসুল আলম

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

প্রশান্ত কুমার রায়

মোঃ শফিকুল হক



সম্পাদক

কাজী হাসান ইমাম

লোক প্রশাসন সাময়িকী

ত্রয়োবিংশতিতম সংখ্যা, জুন ২০০২/ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯

প্রকৃত প্রকাশকাল অক্টোবর ২০০৪/ কার্তিক ১৪১১

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের

ত্রৈমাসিক জার্নাল

সম্পাদক : কাজী হাসান ইমাম

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৪০৯

টেলিফোন : ৭৭১০০১০-১৬ (পিএবিএক্স)

ফ্যাক্স : ৭৭১০০২৯

ই-মেইল : bpatc@sdnbd.org

ওয়েব সাইট : http://www.bpatc.org

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার : ৩৫১.০০০৫

প্রচ্ছদ : কে, এম, রুহুল মুনির

মূল্য : ১৮০ টাকা

US \$ 10

মুদ্রণ : কমার্শিয়াল আর্ট প্রেস

৮০/৪, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১২০৮৮৮; ৭১১৮৭৫৯

LOK PROSHASON SAMOEKY

Vol. 23, June 2002/Joishtho-1409

Actual Time of Publication : Oct. 2004/ Kartik 1411

Quarterly Journal of

Bangladesh Public Administration Training Centre

Editor : Kazi Hasan Imam

@ Bangladesh Public Administration Training Centre 2002

Telephone : 7710010-16 (PABX)

Fax : 7710029

E-Mail : bpatc@sdnbd.org

Web site : http://www.bpatc.org

BPATC Library : 351.0005

Price : Tk. 180

US \$ 10

লোক-প্রশাসন সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারদের। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব এবং এর জন্য সম্পাদনা পরিষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

সূচিপত্র

পঞ্চম প্রজন্মের এনজিও : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডু এস. এম. মনিরুল হাসান	১
জেডার ধারণা ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত কাজী হাসান ইমাম	১৯
বাংলাদেশ নারী-ক্ষমতায়নের উৎস : একটি মতামত ভিত্তিক পর্যালোচনা রায়হানা আখতার জাহান ড. রেজা হাসান মাহমুদ	৫১
বিনাইদহ জেলায় আত্মহত্যার প্রবণতা : একটি সমীক্ষা মোহাম্মদ সেলিম মোঃ জুলফিকার হোসেন	৬১
<i>Loss Reducing Mechanisms of the Riverbank Erosion Displaces in Bangladesh : A Case of Environmental Disaster</i> M. Zulfiqar Ali Islam	৮৩
<i>Cadastre Information System : An Urgent Need in Bangladesh</i> Byomkesh Talukder	১০১

পঞ্চম প্রজন্মের এনজিও : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

ইন্দ্রজিৎ কুণ্ড *

এস. এম. মনিরুল হাসান **

Abstract : The traditional roles of NGO, in the developmental discourse, have been heading toward a new direction. The authors of this paper believe that the new international world order through free economic activities pave the way for NGOs to take new role in the present day world. This paper argues that the new economic role of NGOs has been undermining the political existence of state. Consequently, creating new economic dependencies for the third world countries.

ভূমিকা

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের (জি.ও) পাশাপাশি এনজিওগুলো সেখানকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন প্রত্যয় দুটি এনজিও ধারণার সমার্থক হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও একই ধারা অব্যাহত রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, রাষ্ট্রের চাইতে এনজিওগুলোই বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে অনেক বেশী সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি.আই.ডি.এস.) এর মতে, (১৯৯০) এনজিওগুলো ঋণদান ছাড়াও অন্যান্য বিষয় যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চেনাবুদ্ধি, ট্রেনিং বিভিন্নভাবেই দারিদ্র্য দূরীকরণে অনেক কার্যকর ভূমিকা রাখছে। হোসাইন তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, এনজিও হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ দিয়ে ঋণ প্রাপ্ত লোকদের আয় ৩৩% বাড়াতে সক্ষম হয়েছিল (Hossain 1994)। আলম তাঁর আরেকটি সমীক্ষায় (Alam 1989) দেখান যে, শুধু গ্রামীণ ব্যাংকই নয় অন্যান্য এনজিও চালিত প্রকল্পও পরিবারের আয় তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি করতে পেরেছিল। মাসুম তাঁর গবেষণাতে একই ধারণা পোষণ করে বলেন যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হয়ে বাংলাদেশের অনেক পরিবারই তাদের নিজস্ব কল্যাণ সাধন করতে সমর্থ হয়েছিল। ইসলাম (১৯৯৭) তাঁর প্রবন্ধে এনজিওদের ইতিবাচক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রত্যয় দুটির সাথে এনজিও প্রত্যয়টি ইতিবাচক ও সমাজের জন্য ত্রাণকর্তা হিসেবে সর্বমহলেই স্বীকৃত হয়েছে। এনজিওরা নিজেরাও একই ধারণা পোষণ করেন বরং তাঁরা আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এই ভাবা শুরু করেছেন যে, (Saifullah 2001) তারা ছাড়া সমাজের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন একেবারেই অসম্ভব।

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

** সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

অন্যদিকে উন্নয়ন ও দারিদ্র্য প্রত্যয়গুলো ব্যবহার করে এনজিওরা আদৌ বাংলাদেশের মত দেশগুলোর উন্নয়ন কতটুকু ঘটাতে পারছে সে বিষয়েও অনেক পণ্ডিত তাঁদের লেখায় সন্দেহ পোষণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানের অনেক গবেষক, তাঁদের অতি সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোতে বরং দেখিয়েছেন যে উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের নামে এনজিওরা বরং দারিদ্র্য সংরক্ষণ করছে (Scholz, 2000)। Petras তাঁর “NGOs: In the Service of Imperialism” শিরোনামে লিখিত প্রবন্ধে এই বলতে দ্বিধা করেন নি যে, উন্নয়নের ও দারিদ্র্য বিমোচনের নামে এনজিওরা প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ হিসেবে কাজ করছে। এনজিওরা দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের নামে তৃতীয় বিশ্বে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা তৈরী করছে যে সমাজগুলো বিনা শক্তি প্রয়োগে উন্নত বিশ্বের তল্লিবাহক হিসেবে কাজ করবে, তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারকে বিস্তৃত করবে তথা আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে উন্নত বিশ্বের কাছে উন্নয়নশীল দেশসমূহ নতুনভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। Petras এর ভাষায় এনজিওরা এমন একটি সমাজের সৃষ্টি করবে যে সমাজের মানুষেরা না হবে প্রতিবাদী, না হবে প্রতিক্রিয়াশীল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের এই নতুন শতাব্দীতে নতুনভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে শোষণের জন্য উপরোক্ত প্রতিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল এর মাঝামাঝি স্বভাবের মানুষের প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনজিওরা এই কাজগুলোই করে যাচ্ছে তথাকথিত উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের আড়ালে। অন্যদিকে এনজিওদের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে Tvedt বলেন যে তারা আসলে ক্ষমতায়ন অথবা দারিদ্র্য দূরীকরণ করছে না, পরিবর্তে তারা এক ধরনের ব্যবসা করছে যা শুধু তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট মুষ্টিমেয় কিছু লোকের জন্য ভাগ্য খুলে দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, Many NGOs do not have any mission, except for one- they are in it for business (Tvedt 1998: 215)। Riddle Ges Robinson-এর মতে যদিও এনজিওরা এসেছে সাধারণ মানুষ তথা গরীব লোকদের উন্নতি ঘটাতে এবং সর্বোপরি সমাজে তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে, তথাপি এনজিওদের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে তা কতটুকু করা সম্ভব সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে (Riddle & Robinson 1993)। পল আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এনজিওরা তাদের লক্ষ্য দরিদ্রতমদের সাহায্য করার বদলে অপেক্ষাকৃত কম দরিদ্রদেরকেই কিছু সাহায্য করতে এগিয়ে গেছে (Paul 1995)। অবশ্য এনজিওরা যে তাই-ই করবে, এটাই যে তাদের প্রকৃত অদৃশ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের পরিপূরক, এই বিষয়টিই বোঝা যাবে আমরা যদি গভীর ভাবে বিষয়টি নিয়ে ভাবি। Hulme এবং Mosley-র (১৯৯৬) লেখাতেও এই একই কথার প্রতিফলন পাওয়া যাবে। অর্থাৎ তাঁরাও গবেষণার মাধ্যমে বলার চেষ্টা করেছেন যে এনজিওরা দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নয়নের নামে সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র অংশকে বাদ দিয়ে বরং অপেক্ষাকৃত কম ও মাঝারী দরিদ্রদের ভাগ্য উন্নয়নেই বেশী মনোযোগী। যদিও

এনজিওদের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডটি শুরু হয়েছিল সমাজের দরিদ্রতমদের দারিদ্র্য দূর করার অঙ্গীকার নিয়ে (Saifullah 2001)। অথচ দারিদ্র্য দূর করতে গিয়ে বরং সহনীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য টিকিয়ে রাখাই তাদের কর্মকাণ্ডের আসল উদ্দেশ্য হিসেবে আবির্ভূত হল। এখন প্রশ্ন হলো কেন এনজিওরা তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই প্রবন্ধে উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজা আমাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। তবুও বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করব এ কারণে যে এনজিওরা তাদের ভবিষ্যত কর্মকাণ্ড-কিভাবে পরিচালনা করবে তা বুঝতে এ প্রশ্নের উত্তর অনেক সহায়ক হবে। অর্থাৎ পরিবর্তিত সামাজিক অর্থনৈতিক (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে) পরিস্থিতিতে নিকট ও দূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশের মত তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশেই এই এনজিওদের ভূমিকা ও স্বরূপ কি হবে, এই বিষয়টি অনুসন্ধানই হবে বর্তমান প্রবেশ্কার মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা আমাদের আলোচনাগুলোকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। এনজিওদের স্বরূপ অন্বেষণে তথ্য রাষ্ট্র ও এনজিওদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করার আগে আমাদের দেখা প্রয়োজন কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও কি চরিত্র নিয়ে এনজিওসমূহ আমাদের মত দেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। Petras (1999) তাঁর লেখায় চমৎকারভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এনজিওরা বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সপক্ষে কাজ করেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে বাণিজ্যিকভাবে নির্ভরশীল করার মধ্য দিয়ে। এই প্রক্রিয়ায় এনজিওরা অগ্রসর হচ্ছে একদিকে বামপন্থী আন্দোলন (Petras 1999) কে নস্যাৎ করার মাধ্যমে, অন্যদিকে একটি নব্য Comprador শ্রেণী সৃষ্টির ভেতর দিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এনজিওরা-কি শুরু থেকেই এ চরিত্র নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল? এই প্রশ্নকে সমান রেখেই এনজিও কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে।

এনজিও কার্যক্রমের পটভূমি

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা পায় বাংলাদেশ। নয় মাস ব্যাপী যুদ্ধে এই নব্য স্বাধীন দেশটি সার্বিক ভাবেই বিধ্বস্ত-দেশ হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এই দেশটিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই সর্বপ্রথম এনজিওদের আগমন ঘটে এই দেশে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশটিকে পুনর্গঠন এবং মানবতার প্রতি সাহায্য এই মানসিকতা নিয়েই জাতিসংঘ মিশন সর্বপ্রথম আসে এই দেশটিতে। যার পূর্ণাঙ্গ নাম ছিল United Nations Relief Operation in Dacca (UNROD)। এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে সাথেই আরো কিছু এনজিও একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাদের কার্যক্রম শুরু করে বাংলাদেশে (Dhar 1997)। অবশ্য কিছু কিছু এনজিও তারও অল্প কিছু আগেই এই ভূমিতে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল। বিশেষ করে ১৯৭০ এর ঘূর্ণিঝড়ে দক্ষিণাঞ্চলের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছিল সেই ক্ষতির পুনর্গঠনের ইচ্ছাতেই কিছু কিছু

এনজিও তাদের যাত্রা শুরু করেছিল এদেশে। BRAC নামক বর্তমানের বিশাল এনজিওটির যাত্রা শুরু হয়েছিল এভাবেই। অর্থাৎ ১৯৭০ এর ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় এবং ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিকে সামনে রেখেই এনজিও সংগঠনগুলো মানবতার পক্ষে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল বাংলাদেশের মাটিতে।

এখন দেখতে হবে কোন কারণে এনজিওগুলো ঠিক এ সময়েই তাদের কার্যক্রম শুরু করল। এটা ঠিক যে নৈতিকতার ও মানবতার প্রতি মানুষের যে অপরিসীম দায়বদ্ধতা রয়েছে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মানবতাবাদী চেতনা বিকাশের প্রতি এনজিওদের মনোভাব পোষণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু আদৌ কি মানবতাবাদী চেতনাই এনজিওদের সংগঠিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল নাকি এর পেছনে আরো কোন পরোক্ষ উদ্দেশ্য রয়েছে। Petras (1999), Saifullah (2001), Elsenhans (1997), Smillie (1995), সেন (১৯৯৯) প্রমুখ এবং আরো অনেকেই মনে করেছেন যে মানবতাবাদী চেতনার আড়ালে আরো কোন পরোক্ষ কারণ রয়েছে এনজিও নামক সামাজিক সংগঠন বিকাশের পেছনে। Petras এর ভাষায় উন্নত দেশগুলো (যেমন: আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপান প্রমুখ) অনুন্নত দেশগুলোতে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে নির্ভরশীলতার বিকাশ এবং কার্যক্রমের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বদরুদ্দীন উমর (১৯৯৩) তাঁর “বাংলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি” এই শিরোনামে এক প্রবন্ধে বলেছেন যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ দেশসমূহকে নব্য সাম্রাজ্যবাদী মোড়কে নির্ভরশীল করে রাখার মানসিকতা নিয়েই বিশ্বে সামাজিক সংগঠনের ধারণার জন্ম দেয়। Douglas (1987) এর মতে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা অতি-কেন্দ্রিক রাষ্ট্র যন্ত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ফলে স্বেচ্ছায় অন্যের উপকার করার যে মানবিক প্রকৃতি, সেটি আধুনিক সমাজ থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু সুষ্ঠু সামাজিক জীবন যাপনের জন্য, সুন্দর মানবিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন স্বেচ্ছায় পরোপকারের মত মানবিক গুণাবলীর। যেহেতু আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্রে তা হারিয়ে গেছে সেজন্যই তার স্থান পূরণ করতেই জন্ম হয়েছে এনজিও সংগঠনের। Hensman (1994) একটু ভিন্নভাবে এনজিও সংগঠনের আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন—তিনি বলেছেন যে, রাষ্ট্রই যে কোন সমাজের সদস্যদের সমষ্টিগত সম্পদ (Public good) বিতরণের ভার নেয়। এখানে সমষ্টিগত সম্পদ বলতে শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রকে বলা যেতে পারে। অর্থাৎ রাষ্ট্রই তার নাগরিকদের শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিবহন এবং অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার প্রয়াস পায়। অন্যদিকে রাষ্ট্র ছাড়াও কোন সমাজের সমষ্টিগত সম্পদ (Public good) বিতরণের প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় সেই সমাজের বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে। অনেক সময়ই বাজার ব্যবস্থা প্রয়োজন ও চাহিদাকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় সমষ্টিগত

সম্পদ (Public good) বিতরণ করতে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিফলতা ও বাজার ব্যবস্থার অকার্যকরতা এই দুটি অবস্থার কারণেই, Hensman মনে করেন, এনজিও ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। Smillie (1994) অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে, বাজার ব্যবস্থা অথবা রাষ্ট্রের ব্যর্থতার কারণেই যদি এনজিওদের বিকাশ ঘটত তাহলে পৃথিবীতে অনেক ছোট ছোট সম্প্রদায়গুলোতে অনেক আগেই এনজিওদের অনুপ্রবেশ ঘটত। বরং তাঁর মতে আধুনিক সমাজের সে সমস্ত জায়গাতেই এনজিওদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে যেখানে মানুষের পরোপকার অথবা স্বেচ্ছা পরোপকার করার মানসিকতা হ্রাস পেয়েছে অথবা লোপ পেয়েছে। Saifullah (২০০১) অবশ্য এই যুক্তিকে খণ্ডন করে বলেন যে যদি স্বেচ্ছা পরোপকারের অভাবের কারণেই এনজিওদের বিকাশ ঘটত, তাহলে ভারতীয় উপমহাদেশে, যেখানে পরোপকারের ব্যাপক দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং সংগঠন আকারেও যার অস্তিত্ব রয়েছে, সেখানে ব্যাপক এনজিওদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাবে কেন। অন্যদিকে Eelsenhans আরেকটু ভিন্ন দৃষ্টি পোষণ করে বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত অঞ্চলের সরকার তাদের জনগণের দারিদ্র্য দূরিকরণে ব্যর্থ হয়েছে, সে সমস্ত অঞ্চলেই কেবল এনজিওদের বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

নব্য উদারনীতি দর্শন

যদিও এতক্ষণ এনজিওদের উদ্ভবের একটি বিস্তারিত এবং বহুমুখী ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তথাপি এর বাইরে আরো কোন কারণ কি পরোক্ষভাবে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে না? এটা ঠিক যে রাষ্ট্র কাঠামোর দুর্বলতা, পরোপকার প্রবণতার অভাব অথবা প্রচলিত বাজার কাঠামোর ব্যর্থতা এনজিওদের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে তুলেছিল। কিন্তু এ সবগুলো যুক্তির বিপক্ষে প্রতীয়ুক্তিও কম উপস্থাপিত হয়নি। অনেক উন্নয়ন সমাজবিজ্ঞানীও (Korten 1990; Clark 1991) এ বিষয়ে যথেষ্ট বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা মনে করেন বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া এই বিষয়টিকে নতুনভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। নব্য-উদারনীতিবাদী চেতনায় বিশ্বাসী বর্তমান বিশ্ব এখন বিশ্বসমাজ (Globalization Society) বিনির্মাণে সচেষ্ট। এই বিশ্বায়িত সমাজে কেউই আলাদাভাবে বসবাস করতে পারবে না। সুতরাং বিশ্বায়িত সমাজে সমন্বিতভাবে বসবাস করতে হলে একটি একক সমন্বিত অর্থনৈতিক বাজার ব্যবস্থারও প্রয়োজন। ধরে নেয়া হয় যে এই সমন্বিত একক বিশ্ববাজার ব্যবস্থা দারিদ্র্য দূরিকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সমর্থ হবে। অনুন্নত দেশগুলোর রাষ্ট্রকাঠামো যা করতে ব্যর্থ হয়েছে, নব্য উদারনীতিবাদী দর্শনে প্রভাবিত বিশ্ব বাজার ব্যবস্থা তাই-ই করতে সফল হবে অর্থাৎ দারিদ্র্য দূরিকরণে সফলকাম হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বিশ্ব ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মত বিশ্ব সংগঠনসমূহ তাদের কার্যক্রম পরিচালিত করছে। এই সমস্ত বিশ্ব সংগঠনসমূহের

সুপারিশের ভিত্তিতে উন্নয়নশীল দেশসমূহের সরকারবৃন্দ এনজিওদের তাদের স্ব স্ব দেশসমূহের দারিদ্র্য বিমোচনের সহযোগী অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করা শুরু করেছে (Takarala 2001)। সরকার দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা তথা বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে ফেলছে আর তার স্থান গ্রহণ করছে এনজিওগুলো। এই পরিবর্তিত অবস্থার নিরিখেই প্রকৃত পক্ষে বিস্তার ঘটছে এনজিও নামক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের। আর এ সব কিছুর পেছনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে বর্তমান বিশ্বের নব্য-উদারনীতি দর্শন।

বাংলাদেশে এনজিওদের ব্যাপ্তি

এতক্ষণ আমরা এনজিওদের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আলোচনার সময় মনে রাখতে হবে এই আলোচনা সাধারণভাবে সকল দেশের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও। এই অংশে আমরা দেখার চেষ্টা করব এনজিওগুলোর ব্যাপ্তি বাংলাদেশের বেলায় কি রকম হয়েছিল। যদিও প্রাথমিকভাবে মানবিক সাহায্যকে উদ্দেশ্য করেই এনজিওদের যাত্রা শুরু হয়েছিল এদেশে, কিন্তু পরবর্তীকালে এর কার্যক্রমের পরিধি আর সেরকম থাকল না। এই বিষয়টিকে এনজিও বিশেষজ্ঞ David Korten চমৎকারভাবে তাঁর লেখায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে এনজিওসমূহ অন্যান্য দেশগুলোর মত বাংলাদেশেও তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল সাময়িকভাবে বন্যা, মহামারি, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে মানুষকে রক্ষা করার মধ্য দিয়ে। কিন্তু পরবর্তীকালে লক্ষ্য বদলে গিয়ে কার্যক্রম শুরু হল মানুষকে স্বনির্ভর করার মানসিকতা ও ক্ষমতা সৃষ্টির চেষ্টার মধ্য দিয়ে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা বিভিন্ন ধরনের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু যখন থেকে এনজিওরা অনুভব করল যে শুধুমাত্র সক্ষমতা অর্জনের দক্ষতা দিয়ে মানুষের উন্নতি সম্ভব নয় তখন থেকেই গ্রহণ করা শুরু হল নতুন কার্যক্রমের। এ পর্যায়ে এনজিওসমূহ কিভাবে মানুষের তথা সমাজের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব তা নিয়েই ভাবা শুরু করলেন এবং নতুন মাত্রার প্রকল্প প্রণয়নে তারা মনোযোগী হতে শুরু করলেন। এ পর্যায়ে এনজিওসমূহ তাদের প্রকল্পের পরিধি স্থানিক পর্যায়ে থেকে বদলে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বর্ধিত করতে শুরু করে এবং ক্রমাগতভাবে তাদের কার্যক্রমের সাথে সমাজের একটি অংশের সংযোগ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এনজিওগুলো এখানেই থেমে থাকল না। ক্রমান্বয়ে সমাজের মানুষগুলোর সাথে, যাদের সাথে এনজিওরা তাদের কার্যক্রম নিয়ে জড়িত, তাদের সাংগঠনিক সম্পর্ক রক্ষার দিকে মনোযোগী হল। এ হচ্ছে David Korten এর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে এনজিওদের কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোচনা। এখন আমরা দেখব David Korten (1988) বিষয়টিকে কাঠামোগতভাবে কিভাবে তাঁর লেখায় উপস্থাপন করেছেন। বিষয়টি এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করা হচ্ছে এই ভেবে যে

তা আমাদের এই প্রবন্ধের মূল আলোচনাকে বুঝতে সাহায্য করবে। David Korten (1990) বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখেছেন যে কার্যক্রমের দিক থেকে এনজিওদেরকে চারটা পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমত: প্রথম প্রজন্ম এনজিও, দ্বিতীয়ত: দ্বিতীয় প্রজন্ম এনজিও, তৃতীয়ত: তৃতীয় প্রজন্ম এনজিও এবং চতুর্থত: চতুর্থ প্রজন্ম এনজিও। এখন আমরা দেখব যে বিভিন্ন পর্যায়ে এনজিওসমূহ কি ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল।

(ক) প্রথম প্রজন্ম এনজিও : এই ধরনের এনজিও একেবারে প্রথমদিকে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল। মূলত গরীবদের প্রতি মানবিক সাহায্যের নিমিত্তেই প্রধানত তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল হঠাৎ করে কোন প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের সময় সাময়িকভাবে সাধারণ মানুষের দুর্দশা লাঘবের। এই বিষয়কে মাথায় রেখেই এনজিওরা ব্যক্তি অথবা পরিবারসমূহ, যারা বিপর্যয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাদেরকে সাময়িকভাবে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছিল। এনজিওরা ভেবেছিল যে সাময়িক দুর্দশা থেকে মুক্ত হলেই দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবারবর্গ নিজেদের ক্ষমতাবান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং আবার স্বচ্ছল ও স্থিতিবস্থায় ফিরে আসবে। বেশীর ভাগ বাংলাদেশী এনজিও (প্রথম প্রজন্ম এনজিও) তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ১৯৭৪ সালের প্রলয়ংকরী বন্যাকে কেন্দ্র করে। ব্র্যাক (Bangladesh Rural Advancement Committee), গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB), প্রমুখ এনজিওদের যাত্রা শুরু এ সময়ই। এনজিওরা ভেবেছিল স্বল্পস্থায়ী সাহায্যের মধ্য দিয়ে বিপর্যস্ত মানুষের শক্তিকে কিছুটা ফিরিয়ে আনা যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের গরীব মানুষের জন্য প্রয়োজন ছিল দীর্ঘস্থায়ী এবং টেকসই প্রক্রিয়ায় সাহায্য।

(খ) দ্বিতীয় প্রজন্ম এনজিও : উন্নয়ন প্রত্যয়টি এই পর্যায়ের এনজিওদের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়। উন্নয়ন প্রত্যয়টি মাথায় রেখেই এ পর্যায়ের এনজিওরা তাদের প্রকল্পগুলো প্রণয়ন শুরু করল। উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে উন্নয়ন করার চেতনাকে সৃষ্টি করা, স্বনির্ভর স্থানীয় সমাজ সংস্থাকে উৎসাহিত করা। এ পর্যায়ে এনজিওরা সমাজের উন্নয়নের প্রভাবক হিসেবে আবির্ভূত হল পূর্বের রিলিফ সাহায্যাদাতার স্থলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্ম হয়েছিল তা ক্রমান্বয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল এনজিওরা এ সময়ে কখনোই সমন্বিত কোন উন্নয়নের কথা ভাবতো না এবং সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তন এবং ক্ষমতার কাঠামো পরিবর্তন ছাড়া যে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয় সে বিষয়টিও এ পর্যায়ের এনজিওসমূহ তাদের পরিকল্পনায় স্থান দেয়নি।

(গ) তৃতীয় প্রজন্ম এনজিও : এ পর্যায়ে এনজিওসমূহ তাদের পূর্বের কাজের অগ্রগতি ও ব্যর্থতাকে মনে রেখে তাদের কার্যক্রমকে স্থানীয় পর্যায়ে না রেখে আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়াস পায়। এ পর্যায়ে এনজিওসমূহ টেকসই উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব সে বিষয়ে তাদের কার্যক্রমগুলো পরিচালিত করা শুরু করলেন। টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত পরিবর্তনের সূচনা। আর এরই সূত্র ধরে তারা বিশাল বিশাল প্রকল্প প্রণয়নে মনোনিবেশ করলেন যাতে বিশাল জনসংখ্যার মানুষ চেতনাগতভাবে পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়। কারণ এই পরিবর্তনের চেতনা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সম্ভব হবে একটি সমাজের কাঠামোগত তথা ক্ষমতার কাঠামোর পরিবর্তনের সূচনা ঘটানো।

(ঘ) চতুর্থ প্রজন্ম এনজিও : এ পর্যায়ের এনজিওরা প্রাথমিক ভাবে অনুভব করতে শুরু করে যে মানুষকে কাঠামোগত পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করতে হলে আগে সাধারণ মানুষদের যারা ক্ষমতাহীন কিন্তু পরোক্ষভাবে ক্ষমতার স্রষ্টা, তাদেরকে সুসংগঠিত করতে হবে এবং এই সংগঠনের সূচনা ঘটবে পারস্পরিক সম্পর্কের বেড়াজালে (Network) আবদ্ধ হয়ে। এনজিওদের এই ধারাটিই বর্তমান সময়ের এনজিওসমূহের প্রতিনিধিত্ব করছে। এনজিওদের কাজ হচ্ছে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে গড়ে তোলা, যাতে তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় নিজেরাই চেতনাগতভাবে এগিয়ে আসে। এনজিওরা শুধু এই সম্পর্ক সৃষ্টিতে প্রভাবক হিসেবেই কাজ করবে এর বেশী কিছু নয়। এডাব (Association of the Development Agencies in Bangladesh), NGO Forum for Drinking Water, Credit and Development Forum, Coordination Council for Human Rights in Bangladesh প্রমুখ সংগঠনসমূহ এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তৈরী হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে David Korten এনজিওদের কর্মতৎপরতাকে যেভাবে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন ঠিক সেভাবে সুস্পষ্টভাবে সবগুলো এনজিওকে তাদের কর্মতৎপরতার উপর কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধাপে বা বর্তমানে চতুর্থ ধাপে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে দেখা যাবে না। কারণ এখনও বহু এনজিও তাদের কর্মতৎপরতায় কখনও শুধুমাত্র সাহায্য কেন্দ্রিক, কখনও বা দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কেন্দ্রিক কখনও বা দীর্ঘমেয়াদী টেকসই উন্নয়ন কেন্দ্রিক কখনও বা মিশ্র কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করেছে। তবুও আলোচনার সুবিধার্থে David Korten এর ধাপগুলো এনজিওদের ক্রম পরিবর্তনশীলতাকে বুঝতে অনেকাংশে সাহায্য করবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এনজিওদের কর্মকাণ্ডসমূহ কি এই চতুর্থ ধাপেই শেষ হয়ে যাবে? নাকি রূপান্তরের ক্ষেত্রে অন্য কোন পর্যায়ে উন্নীত হবে। মূলতঃ এই বিষয়টিই এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিষয়টিকে বোঝার জন্যই আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনা অব্যাহত রাখব।

এনজিওদের কর্মপদ্ধতির পঞ্চম ধাপ

Korten যেখানে চতুর্থ ধাপের এনজিওদের নিয়ে তার আলোচনা শেষ করেছেন ঠিক সেখান থেকেই এই প্রবন্ধের মূল আলোচনা শুরু। বর্তমান পৃথিবী একটি নব্য বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মুখোমুখি হচ্ছে অচিরেই, আর সেই ব্যবস্থার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের মত দেশগুলো অবশ্যই নতুনভাবে পরিচালিত হতে বাধ্য। এই নব্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অধীনে বাংলাদেশের মত রাষ্ট্র ও এর জনসাধারণের কাঠামোগত ভূমিকা আদৌ কি বর্তমানের মত পরিচালিত হবে? এক্ষেত্রে এনজিওরা কি কোন নতুন আদলে তাদের কার্যক্রম শুরু করবে? এই নতুন কার্যক্রমের ফলে সরকার তথা রাষ্ট্রের সাথে এনজিওদের সম্পর্কের পরিধি কিরকম হবে? একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, আমরা কেন ভবিষ্যতের পৃথিবীকে একটি নব্য অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে আবর্তিত হবে বলে মনে করছি। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিকভাবে একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী হবে একেবারেই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত। মুক্ত বাণিজ্য অর্থনীতিতে ক্রমশ অনুপ্রবেশ করছে পৃথিবী। এর ফলে অর্থনৈতিকভাবে সমগ্র বিশ্বব্যাপী শুদ্ধ মুক্ত বাজার ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে। বর্তমানে জাতি-রাষ্ট্রগুলোর স্ব স্ব সরকার তাঁদের সীমা রেখার মধ্যে শুদ্ধনীতি তৈরী ও পরিচালনা করেন। সরকার তাঁর স্বার্থকে সংরক্ষণ করার জন্য পণ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থাকে শুদ্ধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে বাজার ব্যবস্থার উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে বাজার সর্বাঙ্গীনভাবে তার চরিত্রকে জাতিরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বাস্তবায়িত করতে পারে না। বর্তমানের জাতি রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই তাদের অর্থনৈতিক তথা গোটা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখছে। কিন্তু যে মুহূর্তে বাজারকে জাতি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করা হবে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিরাষ্ট্রের কোন রকম নিয়ন্ত্রণই যখন আর কার্যকর হবে না এবং এই প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করার জন্য যখন প্রয়োজনীয় বিশ্ব অর্থনৈতিক (Universal Institutions) প্রতিষ্ঠানগুলোর সৃষ্টি হবে (যেমন: GATT, WTO ইত্যাদি) ঠিক তখনই বাজার তার নিষ্পৃহ নীতিগুলো কার্যকর করতে পারবে ভবিষ্যতের সমাজ ব্যবস্থায়। এই প্রক্রিয়াকেই বর্তমান প্রবন্ধে নব্য বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের এই পরিবর্তিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এনজিওসমূহ সাধারণ মানুষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা সফলভাবে পালন করছে বলে বিশ্ব জনমতের কাছে ইতোমধ্যেই প্রতিভাত হয়েছে। Farrington এবং অন্যান্য সম্পাদিত (১৯৯৩) প্রবন্ধসমূহে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে। রাষ্ট্রীয় যন্ত্র সাধারণ মানুষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বরং ব্যর্থই হয়েছে তাদের অদূরদর্শিতা ও দুর্নীতির কারণে। অন্যদিকে এনজিওসমূহ তাদের লক্ষ্য, উন্নত ব্যবস্থাপনা ও স্বল্প আকারের কারণে অতিসহজেই সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করতে সাহায্য করেছে তথা সাধারণ মানুষের

কথাকে উন্নয়নের ডিসকোর্সে স্থান দিয়েছে। বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবেই সাফল্যের দাবিদার। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অদূরদর্শী ও দুর্নীতিপরায়ণ সরকার তথা রাষ্ট্রের দরিদ্র্য দূরীকরণের নিষ্ফল প্রয়াসের চাইতে অন্তত এনজিওসমূহ কিছুটা হলেও আশার আলো ও উদ্দীপনা ছড়িয়েছে। বিষয়টি যতটা সরলভাবে দেখানো হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা কতটুকু সরল সে বিষয়টির একটি বস্তৃগত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অর্থাৎ ‘রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে এনজিওদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্যজনক কর্মসম্পৃক্ততা সম্ভব’-- এই বিষয়টি অতিমাত্রায় সরলীকরণ করে দেখা হয়েছে বিভিন্ন একাডেমিক আলোচনায়। এনজিওদের যে একটি বিপরীত ও নেতিবাচক ভূমিকা রয়েছে তা স্পষ্ট হবে (Tvedt 1998; Saifullah 2001) প্রমুখদের লেখার মধ্য দিয়ে। এই ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকাকে সামনে রেখেই আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব একবিংশ শতকে এনজিওদের ভূমিকা শেষ পর্যন্ত কি রকম হতে পারে। এই বিষয়টিকে উপস্থাপনের লক্ষ্যেই আমরা এই আলোচনা কতগুলি উপবিভাগে বিন্যস্ত করব। পঞ্চম স্তরে রাষ্ট্র ও এনজিওদের মধ্যকার সম্পর্কের রূপরেখা রাষ্ট্র এবং এনজিওসমূহের মধ্যে কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ইতোমধ্যেই একদিকে সহযোগিতা অন্যদিকে প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। যে সমস্ত কাজে সরকার সাফল্যজনকভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারছে না এবং যেখানে সমাজের এলিট শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না সেখানে সরকার খুবই ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এনজিওদের সহযোগিতা করেছে। অন্যদিকে যে সমস্ত কাজে সরকারের এবং সমাজের এলিট শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে সেখানে ক্রমাগতভাবেই সরকার ও এনজিওদের মাঝে একধরনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে এবং এর পরিণতিতে সৃষ্টি হচ্ছে এক ধরনের প্রতিযোগিতা (Farrington and Lewis 1993)। ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন প্রয়াসী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহ (Lewis 1993)। তবে একথা বললে ভুল হবে না যে, প্রথমদিকে এনজিও ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবিধ কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্র এনজিওদের খুব ভালভাবে সহায়তা করেছে। সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন প্রাথমিক শিক্ষা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, হাঁস-মুরগী ও পশুপালন প্রকল্প, গণশিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকার ও এনজিওরা একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করেছে। এক্ষেত্রে সরকারের মূল ভূমিকা হচ্ছে সহায়তাকারী। ক্রমশই সরকারের এই সহায়তাকারী ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকায় রূপান্তরিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সরকার ততদিনই এনজিওদের প্রতি সহায়তাকারীর ভূমিকা নিয়েছে যতদিন পর্যন্ত এনজিওরা সরকারের স্বার্থের প্রতি কোন রূপ হুমকি হয়ে দাঁড়ায়নি। যখন থেকে সরকার তার অস্তিত্বের ক্ষেত্রে এনজিওদের কর্মকাণ্ডকে হুমকির মত মনে করা শুরু করেছে তখন থেকেই নানাদিক দিয়েই এনজিওদেরকে নিয়ন্ত্রণের বেড়া জালে নিয়ে আসতে শুরু করেছে। ১৯৮৯ সালের দিকে বাংলাদেশে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সৃষ্টি করা হয় এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ

করে ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে এনজিওদের কর্মকাণ্ডকে রাষ্ট্র খুব একটা ভালভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ২০০১ সালের নির্বাচনোত্তর রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডকে বিশ্লেষণ করে। রাষ্ট্র এখন শুধুমাত্র বিভিন্ন প্রকল্পের ভেতরই এনজিওদের কর্মকাণ্ডকে সীমিত করতে চাচ্ছে না, বরং যে বৈদেশিক ফান্ড এর উপর এনজিওরা প্রায় পুরোপুরি নির্ভরশীল তা নিয়ন্ত্রণের জন্যও প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন প্রস্তুত করতে নিজেদেরকে মনোনিবেশ করেছে। এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই রাষ্ট্র তথা বাংলাদেশ সরকার এনজিওদের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণের নিরিখে নিম্নলিখিত নীতিমালা প্রায় চূড়ান্ত করেছে। এগুলো নিম্নরূপ :

- (ক) এনজিওদেরকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না।
- (খ) এনজিওদের তাদের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ যেমন: বই ইত্যাদি সরকারের শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনকৃত হতে হবে।
- (গ) দাতাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের আগে সরকারের কাছ থেকে এনজিওদের অনুমতি নিতে হবে।
- (ঘ) বিদেশি সাহায্য কিভাবে ব্যয় হচ্ছে সে বিষয়ে এনজিওদেরকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হতে পারে।
- (ঙ) ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ আদায় করলে সরকার সেই এনজিওদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- (চ) এনজিওদের কর্মকাণ্ডে স্থানীয় প্রশাসন যেমন (টি.এন.ও, জেলা প্রশাসক, চেয়ারম্যান) প্রমুখদের অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা হয়েছে।
- (ছ) সরকার এমন একটি নীতিমালা তৈরী করবে যার ভিত্তিতে এনজিওসমূহের বেতন, ভাতা, প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় এমনভাবে নির্ধারিত হবে যাতে তা বাজেটের একটি নির্দিষ্ট হার অতিক্রম না করে।
- (জ) এমন একটি নতুন আইন তৈরী করা হবে যার ভিত্তিতে স্থানীয় ও বিদেশী এনজিওদের সম্পদকে ট্রাস্ট সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এক্ষেত্রে এনজিওদের সম্পত্তি স্থানান্তর বা বিক্রি করার জন্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন পরবে। এনজিওদেরকে তাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব প্রতি বছর এনজিও বিষয়ক দপ্তরে জমা দিতে হবে।

(প্রথম আলো, ২৩.০৯.২০০২)

সরকারের এনজিও বিষয়ক কমিটির উপর্যুক্ত সুপারিশগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সরকার সার্বিক দিক তথা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পরিচালনাগত সকল বিষয়েই এনজিওদেরকে নিয়ন্ত্রণের উপায় খুঁজছে এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালাচ্ছে। এই প্রবন্ধটি যখন লেখা হচ্ছে তখন পর্যন্ত জানা খবর অনুযায়ী এই

সুপারিশগুলো সরকারের মন্ত্রীসভার অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করছে, অনুমোদিত হলে তা যাবে জাতীয় সংসদে এবং সেখান থেকে বিল আকারে আনুষ্ঠানিকভাবে আইনে পরিণত হবে। তবে বিলটি যাতে আইনে পরিণত হয় সে বিষয়ে সরকারের নীতি নির্ধারণকরা জনসমক্ষে বিভিন্ন ধরনের বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে প্রায় ১৭ মাসে নয়টি সভা করে এনজিও সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি গত ২৪ এপ্রিল ২০০৩ তারিখে এনজিও পরিচালনার জাতীয় নীতিমালা সংবলিত ১৩১ পৃষ্ঠার চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করেছে। (প্রথম আলো, ২৩.০৪.২০০৩)। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এনজিওরা দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে ব্যবসা করছে বলে মন্তব্য করেন এবং তিনি এনজিওদের বলেন-“If you want to do business trade in something else not people's poverty. The country needs to change a beggar's attitude because poverty cannot be eliminated with one or two thousand taka loan. He further said rather there is the need for industrialization and employment generation to eradicate poverty” (The Daily Star, 16.09.02)। সরকার তথা রাষ্ট্র বিভিন্ন আইনী প্রক্রিয়ায় এনজিওদের কর্মকাণ্ডসমূহকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে এই যুক্তিতে যে, যে আদর্শের বা লক্ষ্যের কারণে এনজিওরা কর্মকাণ্ড শুরু করেছিল তার বাইরেও তারা হস্তক্ষেপ করছে। রাষ্ট্র তার বর্তমান কাঠামোর আওতায় সহজেই এনজিওদের এই অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এটা সম্ভব কারণ একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে তা করা সম্ভব। কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার পরও এনজিওগুলো যে সহসাই তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ডের বিলোপ ঘটাবে অথবা রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণ মেনে চলবে, এরকম সরাসরি উত্তর বোধ হয় এরকম প্রেক্ষাপটে আশা করা যায় না। রাষ্ট্র যেমন বর্তমান কাঠামো বজায় রাখবে, এনজিওসমূহও তাদের কর্মকাণ্ডকে অব্যাহত রাখার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাটি কি রকম হবে তা নির্ধারণ করবে। সম্ভবত এই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাই পঞ্চম জেনারেশন এনজিওসমূহকে তার পূর্ববর্তী জেনারেশন এনজিওসমূহ হতে ভিন্নতর অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবে।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বর্তমান সময়ের এনজিওরা শুধুমাত্র সমাজকল্যাণমূলক কাজেই জড়িত নয়, তারা একই সময়ে আয় বাড়ানোর কর্মকাণ্ডের সাথেও জড়িত। এই শেষের কর্মকাণ্ডটি তারা বর্তমানে করছে দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। (ক) একদিকে নিজেদের (এনজিওসমূহ) অবস্থানকে আয় বাড়ানোর মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করা (যেমন সার্ভিস চার্জ বা সুদ গ্রহণের মাধ্যমে); অন্যদিকে (খ) গরীব মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থানকে ঋণের উৎপাদনমুখী ব্যয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করা (Saifullah 2001)। প্রথম কারণটির জন্য এনজিওরা প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করতে পেরেছে এবং সেই উদ্বৃত্ত তারা ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা শুরু করেছে। ব্র্যাক, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক, স্বাবলম্বি উন্নয়ন সমিতি (SUS) ইত্যাদি এনজিও ইতিমধ্যেই

সমাজে একটি বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভূমিকা পালন করছে। তারা আধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক (যেমন-ইন্টারনেট সুবিধা, টেলি কম্যুনিকেশন) বিকল্প বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থাপনা, ডেইরী ফার্ম, চেইন স্টোর (যেমন আড়ং), বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা, কৃষি ফার্ম ইত্যাদি বিবিধ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে এনজিওসমূহের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড মোটেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারবে না, কারণ তারা তথাকথিত বেসিক শিল্পে এখনও মালিকানার হাত প্রসারিত করতে পারে নি। কিন্তু এই বিষয়টিতেই আমরা জোর দিতে চাচ্ছি একটু ভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে এনজিও কার্যক্রম

একবিংশ শতাব্দীর সামাজিক প্রোপট বিংশ শতাব্দী থেকে অবশ্যই কিছুটা ভিন্ন হতে বাধ্য। একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপট হচ্ছে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপট। যেখানে দুটি বৃহৎ শক্তির নিরন্তর প্রতিযোগিতা ও তাকে নিয়ে শিবিরভুক্তির প্রবণতা এখন আর নেই। দুটি বৃহৎ শক্তির পারস্পরিক প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতি একটি একক বিশ্ব স্থাপনে বিশেষ অবদান রাখবে। রাজনৈতিকভাবে না হলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তা এক বিশ্ব বা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে মোটেও বাধাগ্রস্ত করবে না বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করেছে পাশ্চাত্যের একটি শক্তিশালী অংশে (ইউরোপীয় ইউনিয়ন) এক মুদ্রার প্রচলনের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে। ইতোমধ্যেই বিশ্বের আঞ্চলিক জোটভুক্ত দেশগুলো (যেমন: ASEAN, SAARC, EU) একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশের পূর্বশর্ত হিসেবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে টেরিফ উঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। GATT, WTO বিশ্ব সংস্থাগুলো একটি মুক্ত আন্তর্জাতিক বিশ্ব বাজার প্রতিষ্ঠায় অনেক দূরই এগিয়ে গেছে। ইতোমধ্যেই ২০০৫ সালের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব একটি শুষ্ক বাধামুক্ত বাজার হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্য বিশ্বের প্রায় সবদেশই ঐক্যমত্যে পৌঁছেছে এবং এর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশও এই মুক্ত বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশের জন্য যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০০৫ সালের পর থেকে রাষ্ট্রীয় টেরিফ ব্যবস্থা আর কার্যকর থাকবে না। ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থাকবে না বললেই চলে। প্রক্রিয়াটির শুরুতে হয়ত রাষ্ট্র সেভাবে তার কর্তৃত্ব নষ্ট না করতে চেষ্টা করবে কিন্তু প্রক্রিয়া একবার শুরু হলে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব অবশ্যম্ভাবীরূপে চলে যাবে মুক্ত বাজার ব্যবস্থার উপর। মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় যার হাতে টাকা অর্থাৎ পুঁজি থাকবে সেই-ই বাজারকে তথা সামগ্রিক জীবন ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। পেটেন্ট ব্যবস্থার ফলে যার হাতে টাকা থাকবে সে দেশীয় বা বিদেশী যাই হোক না কেন সেই নির্দিষ্ট পণ্যের একচেটিয়া ব্যবসা করার সুযোগ পাবে। একচেটিয়া ব্যবসা শুধু মাত্র মূল্যের ক্ষেত্রে

সীমাবদ্ধ থাকবে না তার বিস্তৃতি ঘটবে পণ্যের উৎপাদন, বণ্টন, সরবরাহ ব্যবস্থার উপরও। এই বিষয়ে উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থার কারণে পণ্যের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণে পেটেন্টধারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তের অধিকারী হবে, রাষ্ট্রযন্ত্র নয়। কারণ রাষ্ট্র তার এই অধিকার ত্যাগ করেই আন্তর্জাতিক মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থায় নিজেকে সম্পৃক্ত করেছে। এই অনিবার্য পরিণতির সাথে এনজিওদের ভূমিকার কি সম্পর্ক রয়েছে? একটু গভীরে চিন্তা করলেই বলা যাবে যে মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ সুযোগ-গ্রহণ করার যাবতীয় যোগ্যতা এনজিওরা ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে। এই যোগ্যতার সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে আর্থিক উদ্বৃত্ত উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন করা। এ বিষয়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ বড় এনজিওই তাদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সক্ষমতা অর্জন করেছে। একটি বিশাল উদ্বৃত্ত এখন তাদের হাতের মুঠোয়।

এই বিশাল উদ্বৃত্ত তারা সম্ভবত পণ্যের পেটেন্ট করার মাধ্যমে ব্যয় করে আর্থিক নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার চেষ্টা করবে। যার প্রতিফলন ইতোমধ্যেই কিছুটা পাওয়া যাচ্ছে ব্রাক এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। ফুরাদান একটি নির্দিষ্ট উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ। যার একমাত্র একচেটিয়া ব্যবসা করার অধিকার রয়েছে ব্র্যাক নামক এনজিওটির হাতে। এভাবে যদি প্রতিটি এনজিওই তাদের আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী মুক্ত বাণিজ্যের কল্যাণে পণ্যের পেটেন্ট করার মাধ্যমে ব্যবসাতে নিয়োজিত হয় (যা স্বভাবতই হবে বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থার কল্যাণে) তা হলে নিকট ভবিষ্যতেই এনজিওরা মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার কল্যাণে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হবে। আর যদি এই বিষয়ে এনজিওরা সফল হয় তবে রাষ্ট্র খুব তাড়াতাড়িই নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকা থেকে আপোষকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। এনজিওদের নিয়ন্ত্রণকারী রাষ্ট্রের আপোষকারী ভূমিকা যে কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য কতটুকু কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আপোষকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রাষ্ট্র কি একটি নব্য কলোনিয়াল যুগে আত্মপ্রকাশ করবে না? আমরা তথা রাষ্ট্র ও সমাজকে পুনরায় শক্তিশালী অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রকদের হাতে কি পরতে হবে না? এর ফলে কি সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার কিছুটা হলেও বিঘ্নিত হবার অবকাশ থাকবে না? এখন সময় এসেছে এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করার। এটা ঠিক, এনজিওরা আমাদের স্থানিক জীবন যাত্রার উন্নতিতে অনেক কার্যকর সাহায্য করেছে। উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষণ করে এই সমস্ত এনজিওদেরকে কি আমাদের মত সমাজগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবহার করা যাবে না? এখানেই মনে হয় সকলের সর্বাত্মে দৃষ্টি দেয়া অধিকতর জরুরী।

উপসংহার

আমাদের উপরের আলোচনায় একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট যে মুক্ত বাজার অর্থনীতির বদৌলতে যে নতুন বিশ্বব্যবস্থায় আমরা পদার্পণ করতে যাচ্ছি সেখানে টিকে থাকার ও প্রভাবশালী ভূমিকা বজায় রাখার জন্য অনেক এনজিওই সক্ষমতা অর্জন করার পথে রয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যে বাংলাদেশেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে বৃহৎ এনজিওসমূহের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা ও আর্থিক সামর্থ্যের সামনে ছোট ছোট এনজিওগুলো টিকে থাকতে পারছে না। বাণিজ্যজগতে বৃহৎ বহুজাতিক কর্পোরেশন (MNC বা TNC) গুলোর সামনে টিকতে না পেরে যেমন ছোট কর্পোরেশনগুলো ক্রমশ একীভূত (Merge) হয়ে যাচ্ছে, তেমনি অদূর ভবিষ্যতে ছোট এনজিওসমূহ হয় হারিয়ে যাবে অথবা বড় এনজিওগুলোর সাথে একীভূত হয়ে যাবে। এছাড়া কিছু কিছু সামাজিক খাতে সাফল্য লাভ করার কারণে রাষ্ট্রের বিকল্প হিসেবে এসব খাতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা, বড় এনজিওসমূহকে সরাসরি রাষ্ট্রের সাথে স্বার্থের সংঘাতে জড়িয়ে দেবে। কিন্তু ছোট এনজিওগুলো রাষ্ট্রের সাথে সংঘাতে টিকে থাকতে পারবে না। অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে পেটেন্ট ক্রয়, বাজার দখল, বাণিজ্য প্রসার ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সংগ্রামে ক্রমশ বড় এনজিওগুলোর গুরুত্ব বাড়বে এবং এনজিওসমূহ এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করবে। ব্র্যাক এর মত দেশীয় (Indigenous) এনজিওর ক্রমশ আন্তর্জাতিক স্তরে (ব্রাক আফগানিস্তান) ছড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে এই ধরনের নতুন রূপের পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে। যদি এই প্রক্রিয়াটি ক্রমাগতভাবে বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয় তাহলে রাষ্ট্র ও এনজিওসমূহের সম্পর্ক এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হবে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে সম্ভবত রাষ্ট্র তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে এনজিওদের মত প্রতিষ্ঠানের কাছে। ফলশ্রুতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ একটি নব্য নির্ভরশীল ও ক্ষমতাহীন রাজনৈতিক অস্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে দ্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়া এনজিওসমূহ আজ চতুর্থ প্রজন্মে উন্নীত হয়েছে। এরাই বিশ্বায়নের নতুন ধারার সুযোগে পঞ্চম প্রজন্মের শক্তিশালী এনজিও হিসেবে আবির্ভূত হবে, এটাই স্বাভাবিক। এই পঞ্চম প্রজন্মের এনজিওদের সাথে কাজ করা ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থকে রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও পদক্ষেপ কি হবে তা নির্ধারণ করাই বর্তমানে অতি জরুরী বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

১. Farrington, J, Lewis, D and others (eds) (1993), Non-Governmental Organization and The State in Asia, New York, Routledge.
২. রুশিদান ইসলাম রহমান (সম্পাদিত) (১৯৯৭) “দারিদ্র্য ও উন্নয়ন : প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।
৩. James Petras (1999), "NGO's In The Service of Imperialism" in Journal of Contemporary Asia, vol, 29 No. 4, Manila.
৪. বদরুদ্দীন উমর (১৯৯৩) “বাংলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি”। পাকি জনযুগ, ঢাকা।
৫. Saifullah, A.K.M. (2001). NGOs Capacity in Development Management: Experience from Bangladesh, Tampure University of Tampure Press.
৬. Korten, D.C. (1987): Third Generation NGO Strategies: A key to people-centered Development, World Development, Vol. 15, Supplement pp. 195-159.
৭. Korten, DC (1988): New Roles and Challenges for Asian NGOs in NGO strategic management in Asia: Focus on Bangladesh, Inonesia and the Philippines, Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Development.
৮. Korten, DC (1990): G. Hing to the 21st Centuries volunteer Action and Global Agenda, West Vestford Kumarian Press.
৯. Tvedt, (1988): Angels of Mercy or Development Diplomats? Trenton: Africa World Press.
১০. Kokarala S, 'Binding Civil Society and Direct Funding of Southern NGOs: A Review of Recent Literature; 2001 (1) Law, Social Justice and Global Development (LGD)., <http://elj.warwick.ac.uk/globe/issue/2001-1/kakaral.html>.
১১. Riddel, R C and Robinson, M (1993): The Impact of NGO Poverty Alleviation Projects: Results of the Case Study Evaluation, Working Paper 68, London: Overseas Development Institute.

১২. Smille, I (1994): Changing Patterns: Northerners NGOs. Northerners Governments. In Smillie I & H Helmich (eds.) Non-governmental Organizations and Governments: Stakeholders for Development, Paris: Development Centre of the Organization for Economic Cooperation and Development.
১৩. Douglas, J (1987): Economic Theories of Nonprofit Organizations, In Walter W Powell (ed.) The Nonprofit Sector: A Research Handbook, PP. 43-54, New Haven: Yale University Press.
১৪. Clark, J. (1991) Demographizing Development: The Role of Volunteer Organizations, London: Earthscan.
১৫. Hulme, D and Mosely, P (1996). Finance against Poverty, Vol. 1 and 2, London: Routledge.
১৬. Elsenhans, H (1997): Marginality, Rent and the Non-Governmental Organizations, In Noorjahan Bava (edt.). Non-Governmental Organizations in Development: Theory and Practice, New Delhi, Kanishka Publishers, Pp. 21-50.
১৭. Hossain, Mahbub (1984): Credit for the Rural Poor: The Grameen Bank in Bangladesh, Research Monograph: 4, BIDS, Dhaka.
১৮. Paul, S (1995): Empowerment of the poor in Bangladesh: the BRAC strategy center for Development studies, University of Wales at Swansea, Unpublished masters thesis. See Saifullah (2001)
১৯. অনুপম সেন (১৯৯৯) বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সমাজ, অবসর, ঢাকা।